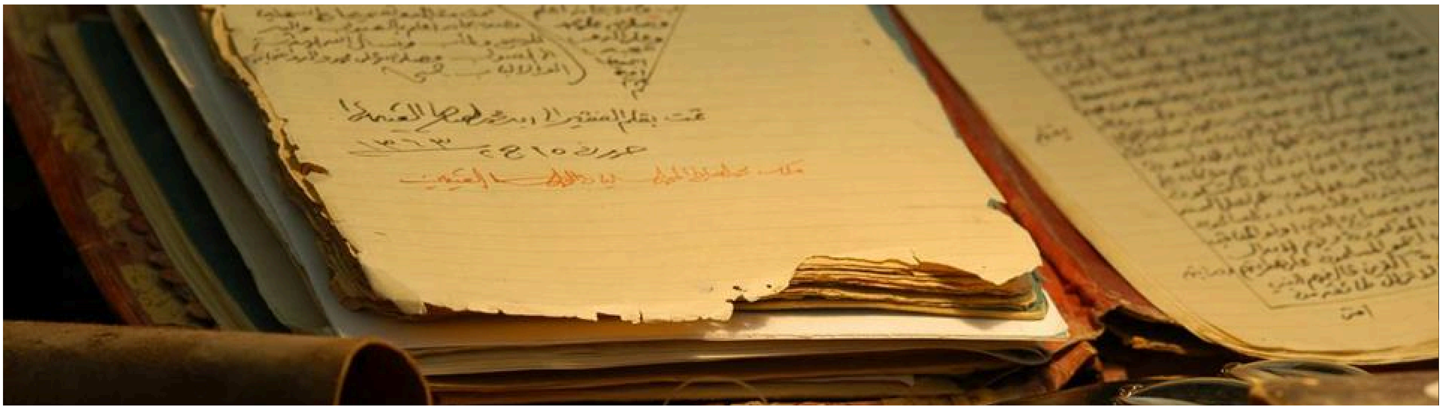

ইকবাল ও আধুনিক শিক্ষা

আবুল হাসান আলী নদভী

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইকবাল কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করে সে-সব দোষত্রুটির গঠনমূলক সমালোচনা করেন এবং যাঁরা শিক্ষা-পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞ তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সে সবের দিকে।

স্কুল, সেমিনারি (ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গন) শিক্ষার্থী দ্বারা ইকবাল সাধারণত পাশ্চাত্য বা পাশ্চাত্য প্রভাবাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সে ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা তরুণদের জন্যে অভিশাপতুল্য, এ ব্যবস্থা তাদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করছে। মাদ্রাসা আর খানকার প্রতিও তিনি অনুকূল মনোভাব পোষণ করতেন না; কারণ, এর শিক্ষায়তনে জীবনের প্রতি আগ্রহ ও প্রেমের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় না, হয় না জ্ঞান আর আদর্শবাদের পরিপোষণ।

মাদ্রাসা আর খানকাহ থেকে হতাশা নিয়ে গাত্রোত্থান করলাম, কারণ সেখানে জীবনের অগ্রগতি সাধিত হয় না, হয় না প্রেম, জ্ঞান বা দৃষ্টি শক্তির পরিপোষণ।

তিনি একইভাবে স্কুলের দেউলেত্ব আর সন্ন্যাসী-আলয়ের অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেনঃ

মাদ্রাসার বিদ্যার্থীরা অজ্ঞ আর কৌতূহলহীন, খানকাহ্‌র সংসার-বিরাগীরা গভীরতাহীন আর উচ্চাকাঙক্ষা-বিবর্জিত,

> ইকবাল দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, আধুনিক শিক্ষা অমলঙ্গকর; কারণ, এ শিক্ষা তরুণদের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে উপেক্ষা করে। এর ফলে যুবকদের মধ্যে চারিত্রিক সংকট দেখা দিয়েছে। ভারসাম্যহীন শিক্ষার ফলে তরুণরা পরিবেশের সংগে, প্রতিবেশের বাস্তব পরিস্থিতির সংগে নিজেকে খাপ খাওয়াতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। সর্বত্রই যে তরুণরা উচ্ছৃঙ্খল ও অস্থির, তার কারণ ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-বিষয়ক পরিকল্পনাজাত আবেগ সংক্রান্ত ভারসাম্যের অভাব। তাদের অন্তর্নিহিত সত্তা ও দৃশ্যমান সত্তার মধ্যে একটা গভীর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। তাদের দেহ আর মনের, জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে অতল ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। পরিণামে তারা অর্জন করেছে দ্বিধা-বিভক্ত ব্যক্তিসত্তা (split personality).

আজকের দিনের তরুণদের মন বুদ্ধিদীপ্ত ও আলোকচ্ছটাময়, কিন্তু তাদের আত্মা অমানিশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তরুণদের মানসিক বিকাশ আর আত্মিক অপকর্ষ উভয়ই ঘটে যুগপৎভাবে। তরুণদের সম্পর্কে ইকবালের ধারণা ছিল সুস্পষ্ট। তাই তিনি তাদের সম্বন্ধে যে সব উক্তি করেছেন আর মত প্রকাশ করেছেন তা কল্পনাপ্রসূলত নয়, একান্তই বাস্তবভিত্তিক। তিনি দুঃখ করে বলেন যে, তরুণদের পানপাত্র শূণ্য, আর তাদের আত্মা দীপ্ত ও প্রাণবন্ত মনে হলেও তা তৃষাতুর। তাদের অন্তর আলোকোজ্জ্বল কিন্তু ভালমন্দের পার্থক্য নির্ণয় ও প্রকৃত উপলব্ধির ক্ষেত্রে অক্ষম। হাল জামানার তরুণদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্বিধা, অনিশ্চয়তা ও নৈরাশ্যগ্রস্ততা আর তাদের অদৃষ্ট হচ্ছে ব্যর্থতা। তরুণদের মধ্যে তারুণ্য নেই, তারা সচল মৃতদেহ। তারা নিজ পরিচয়কে অস্বীকার করে, কিন্তু অন্যের উপর আস্থা স্থাপন করতে সদা প্রস্তুত। পরদেশী আর আগন্তুকরা ইসলামী ভাবধারা নিয়ে গীর্জা আর মন্দির নির্মাণ করছে। পানশালার দ্বারপ্রান্তে মুসলিম তরুণদের শক্তি অপচয়ে নিঃশেষ হচ্ছে। তারা অলস, নিস্ক্রিয় আর আরামপ্রিয় হয়ে

পড়েছে। তাদের অনাসক্তি, জড়তা আর নির্বীর্যতা এমনই অসীম যে, অন্তর-মাঝে তারা আকাঙক্ষার স্পন্দনটুকুও অনুভব করে না। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা তাদের আত্মাকে ভোঁতা আর বস্তুত প্রাণহীন করে দিয়েছে।

মুসলিম তরুণদের মধ্যে আত্ম-শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা আর তাদের অদৃষ্টের প্রতি ঔদাসীন্য ব্যাপক। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে মুসলিম তরুণ ক্ষুদে দু’চার টুকরো রুটির বিনিময়ে তার সত্তা বিসর্জন করতে প্রস্তুত। তরুণদের যাঁরা পরামর্শদাতা তাঁরা তাদের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত তাদের (তরুণদের) মহত্ব ও গৌরব অর্জনের গূঢ় তত্ত্ব শেখাতে আগ্রহহীন। তাঁরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর আনন্দ ও তৌহিদের (আল্লাহ্‌র একত্ববাদের) শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ। তাঁরা পাশ্চাত্য জগৎ থেকে বিগ্রহ ধার করতে মর্মপীড়া বোধ করেন না। হরমের (কাবার) সন্তানরা “কলংকের পথে” তীর্থযাত্রা করতে ও রূক্ষতার পায়ে কপাল ছোঁয়াতে উৎসাহহীন নন। বিন্দুমাত্র রক্তপাত না ঘটিয়ে পাশ্চাত্য জগৎ তাদের হত্যা করেছে। বুদ্ধি তাঁদের উদ্ধত, হৃদয় মৃত আর দৃষ্টি নির্লজ্জ। নিষ্ঠুরতম আঘাত আর সর্বনাশও তাদের অন্তরে কোন রেখাপাত করে না। তাঁদের জ্ঞান আর শিক্ষা, বিশ্বাস আর রাজনীতি, চিন্তা আর আবেগ- সব কিছুই প্রেরণা লাভ করে বস্তুবাদের কাছ থেকে। তাদের হৃদয়ে কামনার ঢেউ জাগে না, মন তাদের উন্নত চিন্তা-ভাবনা-বিবর্জিত আর তাদের গোটা অস্তিত্বের উপর চেপে বসেছে স্নায়বিক দুর্বলতা আর নিশ্চলতা।

স্কুলে আজকাল খোঁদাই করে যে মূর্তিগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে তাদের অঙ্গে না আছে আযরের পরশ না আছে সৌন্দর্য।” বিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষা দেন তাঁদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এইঃ “ঈগল-শাবকদের তাঁরা জাগতিক বিষয়াদির পাঠ দান করেন।” “ধর্মীয় শিক্ষার বিদ্যালয় তোমার শ্বাস রোধ করেছে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র ধ্বনি আসবে কোত্থেকে?” “মাদ্রাসায় কি চিন্তার সৌন্দর্য আছে? খানকায় কি বর্তমান আছে রহস্যের আনন্দ?” “ঈমানের সুরা থেকে জীবনের ঊষ্ণতার উৎসারণ, হে প্রভু, ধর্মীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে এ তরল অগ্নি দান কর।” “এই কি আধুনিক দুনিয়ার গোটা ভাগ্য- আলোকোজ্জ্বল মন, অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তঃকরণ, অতিনিকৃষ্ট আঁখি?” “হায়! তপ্ত শোনিত প্রবাহিত হচ্ছে স্কুলের যে তরুণের শিরায় সেই কি-না পশ্চিমের ইন্দ্রজালের অসহায় শিকার! তরুণরা তৃষ্ণার্ত, পেয়ালা তাদের শূন্য, তাদের মুখমন্ডল মার্জিত, আত্মা অন্ধকার, বৃদ্ধিবৃত্তি দীপ্ত।” “দৃষ্টিহীন, বিশ্বাস-বিহীন, আশাহারা তরুণের দৃষ্টি বিশ্বে কিছু দেখতে পায় না।

এ অবস্থা সত্ত্বেও ইকবাল হতাশ-বিমর্ষ হননি। তরুণদের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা, আর তাঁর কবিতায় তাদের জন্য আশা আর উৎসাহের বাণী অভিব্যক্তঃ

“আমি সেই সব তরুণদের প্রতি আসক্ত যারা ফাঁদ পাতে নক্ষত্র ধরতে। “প্রভাতে আমার হৃদয়ে যে হা-হুতাশ তা দান কর তরুণদের অন্তরে!” ঈগল-শাবকদের পুনরায় পালক আর পাখা দান কর! হে প্রভু! আমার একটি মাত্র কামনা আছে- প্রত্যেককে আমার দূরদৃষ্টি এনায়েত কর।”

এই আশা আর প্রত্যাশার এক ঝলক দেখা যায় তাঁর “খিতাব বা জওয়ানাঁ’-ই-ইসলাম” (ইসলামের তরুণদের উদ্দেশ্যে ভাষণ) ও অন্যান্য ক’টি কবিতায়। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বজ্জনদের উদ্দেশে তাঁর বাণীতে নীচের পংক্তি দুটো বর্তমানঃ

“আরবের গৌরবের উৎস হরমের প্রচন্ড আবেগ” তার স্থান ভিন্নতর, তার কানুন অনন্য।”

“এক নওজোয়ান কি নাম” (এক তরুণের উদ্দেশ্যে) কবিতায়ও তাঁর চিন্তা-ভাবনা আর আবেগের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়ঃ

“তোমার সোফা ইউরোপের, তোমার গালিচা ইরানের- তরুণদের মধ্যে যখন আমি এ সব বিলাসিতা প্রত্যক্ষ করি তখন অশ্রু হয়ে ঝরে আমার রুধির। পদ আর পদবির কী মূল্য, খসরুর জাঁক-জমকেরই বা কী দাম যখন হায়দারের মতো বীরদর্পে বিশ্বের মোকাবিলা কর না, বা সালমানের মত জগৎকে তুচ্ছজ্ঞানে কর না ত্যাগ, চাকচিক্যময় আধুনিক বিশ্বে যে তুষ্টি খুঁজে পাওয়া যায় না, তা হচ্ছে অকৃত্রিম ঈমানদারের গৌরব, তার সেই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। তরুণদের অন্তরে যখন ঈগলের উদ্যম জাগ্রত হয় তখন তার মঞ্জিল দৃশ্যমান হয়ে ওঠে সুদূর আকাশে! আশা ছেড়ো না! হতাশায় মন আর আত্মার পতন, প্রকৃত বিশ্বাসীর আশা-আকাঙক্ষা বিরাজ করে আল্লাহ পাকের অন্তরঙ্গ জনদের মাঝে। রাজা-বাদশাহদের প্রাসাদ তোমার বিশ্রামস্থল নয়, তুমি রাজপাখি, তোমার বাসা নির্মাণ কর পর্বত-শিখরে।”

ইসলামের পরিবর্তে ভিনদেশী ধ্যান-ধারণা দ্বারা মুসলিম যুবকদের প্রভাবিত দেখলে ইকবাল অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। তাঁর “ফালসাফা-জাদা সৈয়দ-জাদা কেনাম” (দর্শনা-ক্রান্ত সৈয়দ-নন্দনের উদ্দেশ্যে) কবিতায় তিনি লিখেছেনঃ

“তুমি যদি তোমার ব্যক্তিত্ব না হারাতে তবে কেসিঁ-এর দাস হতে না; বুদ্ধির শেষ অনুপস্থিতি দর্শনজীবন থেকে অপসারণ। চিন্তার

নিঃশব্দ সুরমালা হচ্ছে কর্ম-প্রেমের জন্য মৃত্যু। ঈমান দ্বারা জীবন-পথ সংরক্ষিত হয়, ঈমান হচ্ছে মুহাম্মাদ ও ইবরাহীমের গূঢ়তত্ত্ব। মুহাম্মদের শিক্ষামালাকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ, তুমি আলীর পুত্র, বু-আলি (আবু সিনা) থেকে দূরে থাকো। তোমার ভেদাভেদ লক্ষ্য করার দৃষ্টি নেই। তাই বোখারার নেতা থেকে কুরাইশ নেতা উৎকৃষ্টতর।

ইকবাল আধুনিক শিক্ষাকে মুসলমানদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের জন্যে দায়ী বলে গণ্য করেন। তিনি বলেন যে, উদীয়মান তরুণদের অন্তরে উষ্ণতা ও ধর্মানুরাগ নেই। তরুণদের জবানে ধার আছে কিন্তু তাদের চোখে অনুতাপের অশ্রু বা অন্তরে আল্লাহ্-ভীরুতা নেই।

পাশ্চাত্যের সুরমা মাখা চোখে ঔজ্জ্বল্য আছে। সে চোখ আকর্ষণ করে, বাগ্ময়, কিন্তু সিক্ত নয়।

তিনি আধুনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে এ অবস্থার জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী বলে গণ্য করেন। অমঙ্গলের অন্য একটি উৎস হচ্ছে মাত্রাতিরিক্তি যুক্তিবাদ বা প্রতি পদক্ষেপে লাভ আর সুবিধার যুক্তি উপস্থাপন করে আত্মার তেজ-বীর্যকে অসাড় করে দেয়।

নৈতিক ও বুদ্ধিগত অবক্ষয়ের আরও একটি কারণ হচ্ছে অপরিমিত বস্তুবাদ ও পার্থিব উপায়-উপকরণের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ও শিক্ষাকে চাকরি-প্রাপ্তি ও পদ-পদবি লাভের উপায় হিসেবে গণ্য করার দুঃখজনক অভ্যাস।

হে সুদূর আকাশ বিহারী-বিহঙ্গ, মৃত্যু শ্রেয়ঃ সে রুজির চেয়ে যে রুজি ছেটে দেয় পক্ষ আর ব্যাহত করে উড্ডয়ন।

আধুনিক শিক্ষার প্রধান ত্রুটি হচ্ছে এই যে, এ শিক্ষা মাআদ (ভবিষ্যত)-এর পরিবর্তে মাআশ (জড় জীবন) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ শিক্ষা বুলবুলের কণ্ঠ থেকে গান ও তার সৌন্দর্যের বিশিষ্ট প্রকৃতি কেড়ে নেয়। এ শিক্ষা রুটির ব্যবস্থা করে না, তবু কেড়ে নেয় আত্মা।

এটা বুলবুলির বক্ষ থেকে অপহরণ করেছিল সংগীত, আর অপহরণ করেছিল টিউলিপের রক্তের আগুন; তুমি গর্বিত যে বিদ্যালয় আর শিক্ষা নিয়ে তা তোমায় দেয়নি রুটি, তবু ছিনিয়ে নিয়েছে জীবন।

ইকবাল আধুনিক শিক্ষার ক্ষতিকর চরিত্রকে সর্বসমক্ষে ফাঁস করে দিয়েছেন আর নির্ভুলভাবে দুর্বল স্থানগুলোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এই শিক্ষার কল্যাণে মানব জাতি যা কিছু লাভ করেছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে রুটি-রুজি লাভের উপায়ের উপর অত্যধিক গুরুত্ব, অসংগত সুবিধাবাদ, কৃত্রিম কৃষ্টি আর অনুকরণমূলক জীবন-যাপনরীতি।

আধুনিক যুগ হচ্ছে তোমার মৃত্যুদূত, রেজেকের ধান্দায় তুমি আত্মা থেকে বঞ্চিত; তোমার শিক্ষা তোমাকে উন্নত আবেগ থেকে করেছে বিচ্ছিন্ন; যে আবেগ মনকে পলায়ন প্রচেষ্টা থেকে রাখত বিরত প্রকৃতি তোমাকে দিয়েছিল বাজপক্ষীর শ্যেনদৃষ্টি, দাসত্ব তোমার অক্ষিকোঠরদ্বয়ে রেনের আঁখি ঢুকিয়ে দিচ্ছে, স্কুল তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে গূঢ় তত্ত্বগুলো যা পাহাড়ে আর মরু-প্রান্তরের রয়েছে উন্মুক্ত।

আধুনিক শিক্ষার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগঃ এ শিক্ষা আরাম-আয়েশপরায়ণতা, ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তা সৃষ্টি করে জীবনকে, সমুদ্রকে বদ্ধ ডোবায় পরিণত করে। শিক্ষার্থীর জন্যে ইকবালের প্রার্থনা হচ্ছেঃ

আল্লাহ তোমাকে ঝড়-ঝঞ্ঝার সাথে পরিচয় করিয়ে দিন, তোমার সাগরের পানি স্রোতহীন আর নিস্তরঙ্গ।

> আধুনিক শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রাচ্যে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। এ শিক্ষা নির্বিচারে পাশ্চাত্যের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও ভাবাদর্শ অনুকরণের প্রেরণা যোগায়, আর উপনিবেশবাদের পথকে করে প্রশস্ত, প্রাচ্যের জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেয় পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি, আর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ছদ্মাবরণে সৃষ্টি করে নতুন নতুন সমস্যা। যুগ-যুগ ধরে প্রচলিত প্রাচ্যের মূল্যবোধ আর ঐতিহ্যকে অবমূল্যায়ণের মাধ্যমে এমন এক সমাজ সৃষ্টি করার প্রয়াস পায় যে সমাজ, মেকলের ভাষায়, নামে আর জন্মগতভাবে প্রাচ্যের কিন্তু অন্তরবস্তুতে ও বাস্তবে পাশ্চাত্যের।

পশ্চিম দেশীয় শিক্ষা-বিষয়ক পরিকল্পনার মূলে রয়েছে নাস্তিক্যবাদ, অথবা ন্যূনপক্ষে এর ধারণা জন্ম লাভ করেছে মানসিক

অস্থিরতা ও বুদ্ধিগত নৈরাজ্যবাদে; সেই কারণেই এই শিক্ষা একই ব্যাধি আর অসম্ভব ভাবের প্রবেশ ঘটায় তরুণদের অন্তরে, যুক্তিবাদ আর মুক্ত-চিন্তার ছদ্মাবরণে সৃষ্টি করে সংশয়বাদ, অসন্তোষ আর বিশৃংখলা। ইকবালের মতে, বিকৃত দৃষ্টির চেয়ে দৃষ্টিহীনতা ভাল, আর অজ্ঞতা ভাল পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্মহীনতা থেকে।

"আমার কাছ থেকে জেনে নাওঃ অন্ধ শ্রেয়ঃ যার দৃষ্টি বক্র তার চেয়ে; আমার কথা বিশ্বাস কর যে সৎকর্মে নিযুক্ত স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি ভাল সেই বিজ্ঞের চেয়ে যে আল্লাহর অস্তিত্ব করে অস্বীকার।"

যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি মানুষকে মহাশূন্য জয়ে ও বায়ুমন্ডলে উড়ে চলার সামর্থ্য দান করতে পারে, কিন্তু উলটে ফেলে দেয় আর আধ্যাত্মিক নোঙ্গর-ঘাট থেকে বিচ্যুত করে তার উপকারিতা সম্পর্কে ইকবালের সন্দেহ বার বার উচ্চারিত হয়েছেঃ

"কি উপযোগিতা আকাশ পরিমাপকারী বুদ্ধির যে বুদ্ধি নক্ষত্ররাজি আর গ্রহমন্ডলকে প্রদক্ষিণ করে আর হাওয়ার কাঁধে ভর করে ভাসমান মেঘখন্ডের মত উদ্দেশ্যহীনভাবে নিঃস্বীম বায়ুমন্ডলে ভেসে বেড়ায়?"

মানুষ যদিও "সৃষ্টির মহাসমুদ্রে আকাঙ্ক্ষিত মুক্তো" আর "অস্তিত্বের শস্য-ক্ষেত থেকে সংগৃহীত ফসল", তবু আধুনিক শিক্ষা যন্ত্র, উৎপাদন-শিল্প ও বস্তুগত অগ্রগতির অন্যান্য নিদর্শনের তুলনায় তার মূল্য হ্রাস করতে সচেষ্ট। ইকবালের মতে, দুনিয়া মানুষের তাবেদার হওয়া বিধেয়, মানুষের দুনিয়ার কাছে তাবেদার হওয়ার নয়।

"নামিয়ে রেখো না আকাঙক্ষার দীপ তোমার কর্ থেকে, কামনা আর পরমানন্দের দশা অর্জন কর, হারিওনা স্বীয় আত্মা দুনিয়ার চৌরাস্তায়, বিনাশ কর চৌরাস্তা, আর ফিরে এসো নিজের কাছে।" "দুটো জগৎকেই টেনে নাও নিজের কাছে ভেগো না নিজ অস্তিত্বের কাছ থেকে;

প্রত্যক্ষ করো না তোমার বর্তমানকে অতীতের আলোকে, আজকে গতকাল থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না কেউ" "তোমার তো কোন সামঞ্জস্য নেই আল্লাহর (অনুগত) মানুষের সঙ্গে, তিনি বিশ্বচরাচরের কর্তা, তুমি দাসানুদাস, তোমার মাঝে নেই সৈকতেরও অন্বেষা, তিনি নিজের মাঝে ধারণ করেন মহাসমুদ্রের কেন্দ্রস্থল।"

অলৌকিক অনুগ্রহ আর ঐশী প্রত্যাদেশ (ওহী) ছাড়া মানবের উপলব্ধি থাকে অসম্পূর্ণ। পরিপক্বতা লাভের পূর্বে তাকে মুক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত করার অর্থ হচ্ছে খেয়ালিপনা ও উচ্ছৃংখলতাকে আমন্ত্রণ করা। ইকবাল "আযাদি-ই-ফিক্‌র" (চিন্তার স্বাধীনতা) নামের এক কবিতায় (দ্বি-চরণ কবিতায়) লিখেছেনঃ

"চিন্তার স্বাধীনতা ধ্বংস সাধন তাদের জন্যে যাদের নেই বিশোধিত চিত্ত; চিত্তটি যদি হয় অপরিণত তা হলে চিন্তার স্বাধীনতা পরিণত হয় মানুষকে পশুতে বানাবার পন্থায়।"

অপরিণত ভাবাদর্শগুলো যে-ভাবে ব্যাপকতা লাভ করছে আর যে-ভাবে আংশিক-জীর্ণ মতবাদসমূহ বস্তুগত অসন্তোষ সৃষ্টি করছে তা হলো প্রতিটি মস্তিস্ক-তরঙ্গকে দর্শন নামক মর্যাদাবান নামে অভিহিত করার আধুনিক যে বাতিক তার পরিণামঃ

"শাস্ত্রীয় বিদ্যাদান কেন্দ্রের লোকেরা পাণ্ডিত্যের গোলক ধাঁধায় দিশাহারা, আধুনিক যুগে কে আর ভাল মন্দের হিসাব কষবার ধার ধারে?"

"আস্‌র্-ই-হাযির" (আধুনিক যুগ)-শীর্ষক আরও একটা কবিতায় ইকবাল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় গোলার্ধের ত্রুটিগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন যে, প্রযুক্তিবিদ্যার যুগের অশোভন ত্বরা ও অধৈর্য সবকিছুর কাঠিন্য ধ্বংস করেছে আর দর্শনকে পরিণত করেছে কতগুলো চিন্তার অবিন্যস্ত সমষ্টিতে। পাশ্চাত্য জগতে প্রেম (হৃদয়সঞ্জাত আবেগাদি) তার যথার্থ স্থান লাভ করেনি, কারণ সেখানে নিরীশ্বরবাদ প্রেমের আবর্তনের জন্যে কোন অক্ষ রাখেনি, আর চিন্তায় কোন সংগতি ছিল না বলে প্রাচ্যে বুদ্ধি তার ন্যায়সংগত স্থান পায়নি।

পরিণত ভাবরাজি, পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত চিন্তা, কে আছে এ-সব, খোঁজবার বর্তমান যুগের জলবায়ু সব-কিছুকেই অপরিণত রাখে। বিদ্যায়তন বুদ্ধিকে লাগাম ছেড়ে দেয়, কিন্তু প্রেমকে তা না দিয়ে মতগুলোকে অস্পষ্ট, সংগতিহীন আর বিশৃংখল রেখে দেয়। চিত্তের নাস্তিক্যবাদী প্রবণতার কল্যাণে পাশ্চাত্যে প্রেমের ঘটেছে মৃত্যু।" চিন্তার অসঙ্গতির কারণে প্রাচ্যে বুদ্ধি স্বাধীনতাহীন।"

আধুনিক শিক্ষা যুবকদের মধ্যে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকে এতদূর উৎসাহিত করে যে, পরিণামে মৌলিকত্বের ধাত বা স্বাধীন

কর্মস্পৃহার অণু-মাত্র অবশিষ্ট থাকে না। পৃথিবীটাই প্রচলিত রীতির দাস কিন্তু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো আরও বেশ সংকীর্ণ ও গোঁড়ামি-শৃংখলিত, আর সেখানে অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তিরা যুগ-নেতার ভূমিকা পালন করার চেয়ে স্বদলত্যাগী, সুযোগসন্ধানী ও কালের গোলাম হওয়া গৌরবের মনে করেন।

বাদাকশানের চুনির চাষ যদি তোমার হয় উদ্দেশ্য তা হলে খেয়ালী সূর্যের প্রতিবিম্ব তুচ্ছ। বিশ্বটা প্রচলিত রীতির জালে আবদ্ধ, বিদ্যায়তনের কি মূল্য, কি দাম জনদের চেষ্টার? যারা যুগ-নেতার কাজ করতে পারত, হায়! তারাই হয়েছে যুগের আজ্ঞাবহ।

ইকবাল মনে করেন মুসলিম তরুণ-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নেই; তারা পাশ্চাত্যের ছায়া মাত্র এবং তারা কৃত্রিম জীবন যাপন করে তাও ধার করা। নতুন বংশধররা পশ্চিমা কারিগর দ্বারা পিটিয়ে তৈরি করা মাংস আর বস্তুর কাঠামো, কিন্তু এর মাঝে তারা আত্মা প্রবিষ্ট করেনি। এটা এমন একখানা খাপ যার গায়ে অলংকরণের অভাব নেই, কিন্তু ভিতরে নেই অসির অস্তিত্ব। ইকবাল সুতীব্র ক্ষোভের সাথে মন্তব্য করেন যে, তরুণদের দৃষ্টিতে আল্লাহর অস্তিত্ব একটি কল্পকথা আর তার নিজ অস্তিত্ব ছায়তুল্য ও অবাস্তব।

তোমার সত্তা ইউরোপ থেকে সংগ্রহ করে আলোঃ তুমি ইউরোপের স্থপতিদের দ্বারা নির্মিত চার দেয়াল; কিন্তু বাসকারীবিহীন কদর্মনির্মিত এ এমরাত, পুষ্প-চিত্রিত, অলঙ্করণ সজ্জিত শূন্য অসি-আধার; আমার সত্তার কাছে তোমার অস্তিত্ব অপ্রমাণিত। তাকেই বলে জীবন যা থেকে বিচ্ছুরিত হয় আত্মার স্ফুলিঙ্গ, এটা খেয়াল কর! তোমার আত্মার জ্যোতি পড়ে না আমার নজরে।"

পশ্চিমের শিক্ষা সম্পর্কীয় পরিকল্পনা মুসলিম তরুণের আত্মাকে চূর্ণ করেছে, আশা আর উচ্চাভিলাষের অগ্নি-প্রজ্বলিত করার পরিবর্তে তাতে ভরে দিয়েছে যন্ত্রণা আর বিতৃষ্ণা। এ শিক্ষা তরুণদের আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন শিক্ষা দিয়েছে, তাদের কোমল আর স্ত্রৈণ করেছে আর জীবনের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবার ক্ষমতা থেকে করেছে বঞ্চিত। যে শিক্ষা মানুষকে মুজাহিদদের পুরুষোচিত গুণাবলী থেকে বঞ্চিত করে আর জীবনের রণক্ষেত্রে বিলাস-সামগ্রী সরবরাহ করে, যুদ্ধাস্ত্র ছিনিয়ে নেয় সে-শিক্ষাকে ইকবাল মূল্যহীন-অসার বলে মনে করেন।

যে বংশধররা আজ বড় হয়ে উঠছে তাদের কল্যাণে ব্রতীদের কাছে ইকবাল আকুল আবেদন জানান, আর যখন এক ছাত্রবৎসল শিক্ষক ও এক স্নেহশীল অভিভাবকের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ভাবাবেগ প্রকাশ করেন তখন মনে হয় সারা বিশ্বের যন্ত্রণা ঘনীভূত হয়ে তাঁর হৃদয়ে আশ্রয় নিয়েছে, আর গোটা মুসলিম মিল্লাতের দুঃখ-বেদনা তাঁর অস্তিত্বকে করেছে অভিভূতঃ

"হে হরমের বৃদ্ধ! আশ্রমের পোশাক ত্যাগ কর, আমার বিলাপের মর্ম কর হৃদয়ঙ্গম; আল্লাহ তোমার তরুণদের সালামতে রাখুন! তাদের ব্যক্তিত্বের, আত্মকৃচ্ছ্রতার শিক্ষা দাও, তাদের শিলা বিদ্ধ করার পথ বলে দাও, পাশ্চাত্য তাদের কাঁচের জিনিসপত্র তৈরির প্রণালী শিখিয়েছে; দু'শো বছরের দাসত্ব তাদের হৃদয় ভেঙ্গে দিয়েছে; এখন ভেবে-চিন্তে তাদের বিভ্রান্তিমুক্ত করার একটা দাওয়াই বের কর; আমার প্রমত্ততায় তোমার গোপন কথাগুলো প্রকাশ করছি, আমার মর্মযন্ত্রণাও রেখো খেয়ালে।"

সূত্রঃ আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা: নভেম্বর, ১৯৮৯ সংখ্যা

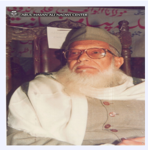

আবুল হাসান আলী নদভী

বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী। উপমহাদেশের গণ্ডী পেরিয়ে যার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল আরব বিশ্বেও। তিনি ১৯১৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর ভারতের উত্তর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। উর্দু এবং হিন্দি উভয় ভাষাতেই তাঁর হাত ছিল সিদ্ধহস্ত। তিনি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার প্রাক্তন রেক্টর এবং পাশাপাশি রাবেতা মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি রাবেতা ফিকাহ কাউন্সিলের সদস্য এবং মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইসলামের সেবার জন্য ১৯৮০ সালে তিনি মুসলিম বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মাননা বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমান সময়ের স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ তারিক রমাদানের পিতা সাঈদ রমাদান (হাসান আল-বান্নার জামাতা) এর সাথেও সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর উষ্ণ ও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল যা তারিক রমাদানের Islam, The West & The Challenges of Modernity বইটির ভূমিকায় আলোচিত হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক জগত ছাড়িয়ে তিনি মাঠ পর্যায়েও ছিলেন সদা তৎপর একজন পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। মুসলিম সমাজে তো বটেই অমুসলিমদের কাছেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল আকাশচুম্বী। ১৯৯৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বর এই মহান মনীষী মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু মুসলিম ভারতের এক ইতিহাসের সমাপ্তি এবং অদূর ভবিষ্যতেও এ শূন্যস্থান পূরণ হবার নয়।